# সরস্বতী ও তাঁর বাহন

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

"হংসারূঢ়া হরহসিতহারেন্দু কুন্দাবদাতা
বাণী মন্দস্মিততরমুখী মৌলিবদ্ধেন্দুলেখা।
বিদ্যা বীণামৃতময়ঘটাক্ষস্
শ্বেতাব্জস্থা ভবদভিমত প্রাপ্তয়ে ভারতী স্যাৎ।।" (তন্ত্রসার)

–যিনি হংসোপরি উপবিষ্টা, শিবহাস্য, হার, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ন্যায় যিনি শ্বেতবর্ণা, যাঁর বদনে সর্বদা স্মিতহাস্য ও কপালে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতকুম্ভ এবং রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাচ্ছে, সেই শ্বেতকমলবাসিনী ভারতী তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন।

সরস্বতী হিন্দুদের অন্যতম প্রিয় দেবতা। শুধু হিন্দুদেরই নয়, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মেও সরস্বতী খুব জনপ্রিয়। বহির্ভারতে তিব্বত, যবদ্বীপ, জাপান, রাশিয়া, আফগানিস্তানেও সরস্বতী–মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, লোকগাথা–সর্বত্র সরস্বতীর জয়গান। অবশ্য মূলত সরস্বতী বৈদিক দেবতা। বেদে পুরুষ দেবতারই প্রাধান্য–সংখ্যা এবং সামর্থ্য উভয় বিচারেই। বেদে কতিপয় স্ত্রী–দেবতার মধ্যে সরস্বতীর উল্লেখই সর্বাধিক এবং তাঁর মহিমাও অপরিমিত বৈদিক দেবতা সরস্বতী তন্ত্র, পুরাণ, কাব্য, ইতিহাসে স্বমহিমায় উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর।

'সরস্' শব্দের উত্তরে অস্ত্যর্থে 'বতুপ্' প্রত্যয়ের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈপ্' প্রত্যয় যুক্ত করে 'সরস্বতী' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। সরস্+ বতী= সরস্বতী। 'সরস্' শব্দের অর্থ আলো বা জ্যোতি, পূর্ণতা এবং প্রকাশ। অতএব 'সরস্বতী' শব্দের অর্থ আলোকময়ী বা জ্যোতির্ময়ী, পূর্ণতাপ্রদাত্রী এবং প্রকাশময়ী। সরস্বতী আলোকস্বরূপিণী বা জ্যোতিস্বরূপিণী। তিনি পূর্ণতাপ্রদাত্রী। তিনি সর্বপ্রকাশিনী। জগৎকে তিনি আলো দান করেন। জগৎকে তিনি পূর্ণতা দান করেন। অন্ধকার দূর করে তিনি বস্তুকে প্রকাশমান করেন। আধ্যাত্মিক অর্থে জ্ঞানই সত্যিকারের আলোক বা জ্যোতি। জ্ঞানের প্রকাশেই মানুষের পূর্ণতা। জ্ঞানই অজ্ঞানকে দূরীভূত করে নিত্যবস্তুকে প্রকাশের সামর্থ্য রাখে। এই জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী।

বেদে 'সরস্' শব্দের একটি অর্থ 'জল'। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ 'জল' ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না। তাঁদের মতের সমর্থনে তাঁরা বেদের গোড়ার দিকের মন্ত্রগুলিকে উল্লেখ করেন। 'সরস্' অর্থে যে 'জল' তা 'সরোবর' (সরস্+ বর) শব্দ থেকে বোঝা যায়। বেদে সরস্বতী নদীরূপেও বন্দিতা। তবে বেদের গোড়ার দিকে 'সরস্' অর্থে 'জল' বোঝাত কিনা সেবিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে (৬৬।৫) এবং সপ্তম মণ্ডলে (৯৬।৪) যে 'সরস্বান্' শব্দটি পাওয়া যায় তার অর্থ 'জলাধিপতি' বলে কারো কারো মত। কেউ কেউ মনে করেন যে, 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ 'জল' নয়, জ্যোতি। তাঁরা বলেন, ঋগ্বেদে (১।১৬৪।৫২) যে 'সরস্বান্' শব্দটি পাওয়া যায়–যা 'সরস্' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন–তার অর্থ সূর্য। সূর্যের সঙ্গে জ্যোতির সম্পর্ক বলার অপেক্ষা রাখে না। 'সরস্বান্' অর্থাৎ জ্যোতিষ্মান বা জ্যোতির্ময়। 'সরস্বান্'–এর স্ত্রীলিঙ্গে 'সরস্বতী'।

'সরস্' শব্দের আরো অর্থ আছে। তবে সেই অর্থ 'সরস্' শব্দের আদিম অর্থ ছিল কিনা তা বলা কঠিন। তবে তা 'সরস্' শব্দের নিতান্তই আধ্যাত্মিক অর্থ এবং বলা বাহুল্য, সেক্ষেত্রে 'সরস্' শব্দের সঙ্গে তার অন্যতম বৈদিক অর্থ 'জল'–এর যে সম্পর্ক আছে তা অনস্বীকার্য। জল চলে, জল সরে, জল গতিসম্পন্ন, জল স্পন্দনশীল। 'সরস্' শব্দের সেই অর্থটি হলো গতি, স্পন্দন, চঞ্চলতা। ভারি চমৎকারভাবে একজন লিখেছেন : "যা সরে, চলে, স্পন্দিত হয়, তাই 'সরস্'। 'সরস্' মানে চঞ্চলতা–সৃষ্টির চঞ্চলতা, প্রাণের ঢেউ, আনন্দের জোয়ার, রসের পাথার। এককথায় ব্রহ্মাণ্ডজোড়া যত স্পন্দন, যত ঢেউ সবই 'সরস্'। আর এই ভুবনভরা চিরচঞ্চলতাকে যিনি ধারণ করে আছেন–তিনিই 'সরস্বতী'। সৃষ্টির প্রাণনির্ঝর এই চঞ্চলতা ফুটছে শব্দ হয়ে, আলো হয়ে, সুর হয়ে, গান হয়ে, তোমার আমার সবার মুখের কথা হয়ে, মন হয়ে, বুদ্ধি হয়ে, ইন্দ্রিয় হয়ে–সব হয়ে–

"ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি ষ ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং তে উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।" (ঋগ্বেদ, দেবীসূক্ত)

–লোকে আমার সাহায্যেই খায়, আমার সাহায্যেই দেখে, শোনে, নিঃশ্বাস নেয়। না জেনে আমাতেই বাস করে তারা। শোন, আমি যা বলছি তা সত্য।"

জীবনের যত শব্দ, জীবনের যত আলো, জীবনের যত সুর, জীবনের যত কথা, মন–বুদ্ধি–ইন্দ্রিয়ের যত ক্রীড়া–সমস্ত কিছুর উৎস কে? অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে আবির্ভূতা দেবী বাক্ আত্মোপলব্ধির এক মাহেন্দ্রক্ষণে ঋগ্বেদে ঘোষণা করলেন– আমিই বিশ্ব–ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী। রুদ্র, বসু, আদিত্য এবং সকল দেবতার মধ্যে আমারই প্রকাশ। মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রমুখের পিছনে আমারই শক্তি। জগতের সৃষ্টির উৎস আমি, তার ধারয়িত্রীও আমি। জলে স্থলে অন্তরিক্ষে এবং তার বাইরেও সর্বত্র আমি বায়ুর মতো ব্যাপ্ত হয়ে আছি। আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাউকে ব্রহ্মা করি, কাউকে ঋষি করি, কাউকে মেধাবান করি। রুদ্রের ধনুকে অসুরনিধনের শক্তি আমারই সংযোজন। সর্বভূতের অন্তর্যামিনীরূপে সকলের হৃদয়ে আমারই অধিষ্ঠান। ত্রিভুবনে সকলে আমারই আরাধনা করে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাকের দেবী বাকের কণ্ঠোৎসারিত ১২৫তম সূক্তটি 'দেবীসূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। কারো কারো মতে, ঋষি বাক্ বা দেবী বাক্ হলেন সরস্বতী। কৃষ্ণ যর্জুবেদ (১।১।৭৭), শতপথ–ব্রাহ্মণ (১।১।৪) এবং সাংখ্যায়ন–ব্রাহ্মণ (৫ম অধ্যায়)–এ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে : "বাক্ বৈ সরস্বতী।"–বাকই সরস্বতী। ঐতরেয়–ব্রাহ্মণ (৩।১৩) এবং অন্য বৈদিক প্রমাণেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, বাক্ এবং সরস্বতী অভিন্ন। সৃষ্টির আদি কারণ বাক্ বা শব্দ(Logos)। তাই বাক্কে বলা হয় ব্রহ্ম–বাক্ষ্ম বা শব্দব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।১।২) বলা হচ্ছে : "বাক্ বৈ ব্রহ্ম।"–বাকই ব্রহ্ম। বাক্ বা শব্দের যিনি অধিষ্ঠান বা আশ্রয়, তিনিই বাকের অধিষ্ঠাত্রী বা বাগ্দেবী। তিনিই সরস্বতী। শতপথ–ব্রাহ্মণে (৫।২।১৩) সেজন্য আবার বলা হলো : "সরস্বতী বাক্।" প্রজাপতি বা ব্রহ্মা সৃষ্টির অধীশ্বর। সৃষ্টির আদি কারণ বাক্ বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। সেজন্য সরস্বতী ব্রহ্মার আত্মশক্তিরূপে ব্রহ্মার দ্বারা আপ্যায়িত। (শতপথ–ব্রাহ্মণ, ৩।৯।৭) নদী যেমন জলের আধার, তেমনি আবার নদীর কলধ্বনিতে নাদেরও আত্মপ্রকাশ। সরস্বতী–তীরে আর্য ঋষিগণ প্রণবধ্বনি উচ্চারণ করতেন। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলত জলে স্থলে অন্তরিক্ষে। নদীর কল্পনাদ এবং ঋষিদের প্রণবনাদ মিলে মিশে একাকার হয়ে বৈদিক সভ্যতার উন্মেষলগ্নে দেবতা সরস্বতীর চিন্ময় তনু সৃজন করেছিল।

ঋগ্বেদে সরস্বতীর ত্রিবিধ রূপ। তিনি মাতৃশ্রেষ্ঠা, তিনি নদীশ্রেষ্ঠা, তিনি দেবীশ্রেষ্ঠা–"অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি।" (২।৪১।১৬)

প্রাচীন আর্যসভ্যতা সরস্বতী প্রভৃতি সাতটি নদীর তীরে বিকাশলাভ করেছিল। তবে সাতটি নদীর মধ্যে সরস্বতীই ছিল সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় নদী। কৃষিজীবী আর্যদের কাছে সরস্বতী সেজন্য প্রতিভাত হয়েছিল অন্নদাত্রী, পালয়িত্রী এবং জননীরূপে। নদীমাতা সরস্বতীর দিব্য প্রভাবেই যেন আর্যগণের অন্তরে জাগ্রত হয়েছিল দিব্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা, তাঁদের হৃদয়ে হয়েছিল সত্যের দিব্য উদ্ভাসন। 'দিব্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন 'দেবী' শব্দের অর্থ দীপ্তিময়ী, আলোকময়ী, দ্যোতনাময়ী। প্রকৃত দীপ্তি সত্যের দীপ্তি, সত্যকে উপলব্ধির দীপ্তি, প্রজ্ঞার দীপ্তি। দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদে আর্য ঋষিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল ঋক্ী মন্ত্র সামগান। বৈদিক সাহিত্যে সেজন্য তিনি দেবীশ্রেষ্ঠারূপে বন্দিতা হয়েছেন। মা যেমন শিশুসন্তানকে রক্ষা করেন, তেমনি আর্যভূমির স্বাভাবিক প্রহরীরূপে মাতারূপিণী নদী সরস্বতী বহিরাগত শত্রুদের আক্রমণ থেকে আর্যগণকে রক্ষা করত। সরস্বতী আর্যগণকে তাঁর অঙ্কে (অববাহিকায়) আশ্রয় দিয়ে তাঁদের মনকে নির্ভার করেছিল,

স্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ পীযূষধারায় তাঁদের দেহ-মনকে সঞ্জীবিত রেখেছিল, তাঁদের মূককণ্ঠে ভাষা দিয়েছিল। নদীরূপে সরস্বতী একদিকে তাঁদের কৃষিক্ষেত্রকে উর্বরা ও শস্যশ্যামলা করে যেমন দেহের অন্ন দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে 'বৃত্রঘ্নী'—বৃত্রঘাতিনী সরস্বতী দেবীরূপে শত্রুর আক্রমণ থেকে অভয় দান করে তাঁদের নিরুদ্বেগ হৃদয়ে প্রজ্বলিত করেছেন সত্য-উপলব্ধির জ্যোতি-দিয়েছেন আত্মার পরমান্ন। নদী-সরস্বতী সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষ পর্বে মরুভূমিতে প্রধানত অবলুপ্ত হয়ে যায়। মহাভারতে সরস্বতীর 'বিনশন' বা অবলুপ্তির যেমন উল্লেখ পাওয়া যায়, তেমনি আবার কোথাও কোথাও মূল ধারার বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বেরও উল্লেখ দেখা যায়। তবে ক্রমে সরস্বতী সম্পূর্ণতই অদৃশ্য হয়ে যায়। আধুনিক কালে রাজস্থান ও গুজরাটের স্থানে স্থানে সরস্বতীর অবলুপ্ত ধারা আবিষ্কৃত হয়েছে।

অবলুপ্ত বা বিনষ্ট হলেও নদী-সরস্বতীর স্থান ভারতবর্ষের মানুষের মনে এমনি মহিমামণ্ডিত যে, সরস্বতীর ''নব নব আবির্ভাব'' কল্পনা করে তারা তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পরিচয়ের স্বাক্ষর রেখেছে। প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মিলনে ত্রিধারার 'যুক্তবেণী' বা 'ত্রিবেণীসঙ্গম' ঘটেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে 'মুক্তবেণী'তে গঙ্গার স্রোতোধারা থেকে অন্তঃসলিলা যমুনা ও সরস্বতী মুক্ত হয়েছে-কোটি কোটি হিন্দুর এটি আবহমানকালের ''প্রিয় এবং পবিত্র বিশ্বাস''। সরস্বতীর এই নব নব আবির্ভাব কল্পনা কিভাবে হিন্দুদের অধিকার করেছিল তার পরিচয় পুরাণাদি প্রাচীন সাহিত্যেও মিলবে।

প্রাচীন আর্যভূমি ছিল সপ্তসিন্ধু বা সপ্তনদী বিধৌত। এই সপ্তনদী হলো-সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা, ইরাবতী ও শতদ্রু। সরস্বতীকে ধরেই আর্যগণ 'সপ্তস্বসা' বা সপ্তভগিনীর বন্দনা করেছেন (ঋগ্বেদ, ৬।৬১।১০)। পরবর্তী কালে যখন সরস্বতীর ধারা বিলুপ্ত হয়েছে এবং আর্য-সংস্কৃতি দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃতিলাভ করেছে তখনো সরস্বতীকে ধরেই নতুন 'সপ্তসিন্ধু' প্রসিদ্ধ হয়েছে-''গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্মদে সিন্ধু কাবেরি...।''

বেদের ব্রাহ্মণ-পর্বে মাতৃশ্রেষ্ঠা, নদীশ্রেষ্ঠা এবং দেবীশ্রেষ্ঠা সরস্বতী বিবর্তনের পথে হয়ে উঠলেন জ্ঞান ও বিদ্যার একতম অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই হয়ে ওঠার পিছনে অবশ্যই বাক্ ও সরস্বতীর অভিন্নতার ধারণা ও উপলব্ধি ক্রিয়াশীল ছিল, তবে নদী-সরস্বতীর বিনশনের পর তাঁর মাতৃ ও নদী-স্বরূপ দেবী-স্বরূপে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি একটি বিশিষ্ট আকৃতিও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বৈদিক যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। সুতরাং বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীর কর্ম ও মহিমার নানা বর্ণনা থাকলেও তাঁর আকৃতির সুনির্দিষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও ঋকের ভাষ্যে (১।৩।১২) সায়নাচার্য বলেছেন : ''দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদ্দেবতা নদীরূপা চ''-সরস্বতীর দুইরূপ, বিগ্রহবতী দেবতা এবং নদীরূপা। 'বিগ্রহবতী' বলতে এখানে সায়নাচার্য যে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর মন্ত্রময় বিগ্রহের কথা বলতে চেয়েছেন সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, ঐকালে মূর্তিপূজার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আকৃতির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও ঋগ্বেদে তাঁকে 'হে শুভ্রে' বলে সম্বোধনে তাঁর শুভ্র বর্ণের ইঙ্গিত আছে। ঋগ্বেদে কোথাও কোথাও সরস্বতীকে সূর্যাগ্নির দ্যুতি বা জ্যোতি, নদীসমূহের মধ্যে শুদ্ধতমা ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী কালে যখন তাঁর শ্বেত বর্ণ, শ্বেত বস্ত্র, শ্বেত অলঙ্কারের বর্ণনা পাই অথবা 'সর্বশুক্লা সরস্বতী'র বন্দনা শুনি, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁর পরবর্তী মহাশ্বেতা রূপের কল্পনায় ছিল তাঁর বৈদিক জ্যোতির্ময়ী, জ্ঞানদাত্রী স্বরূপের ছায়াপাত। 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র আর কিছু নেই। সরস্বতী সেই নির্মল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে তিনি জ্ঞানের জ্যোতি জ্বালিয়ে দেন। এই জ্ঞান আসলে অধ্যাত্মজ্ঞান, এই বিদ্যা আসলে আন্তর বিদ্যা-যে-জ্ঞান বা যে-বিদ্যার প্রাপ্তি শুধুমাত্র সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারাই সম্ভব। সর্বমালিন্য-মুক্তি না ঘটলে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় না। সত্ত্বগুণময়ী জ্যোতিঃস্বরূপিণী, বিদ্যারূপিণী ও পবিত্রতাবর্ষিণী সরস্বতীর অঙ্গবর্ণই তাই শুধু শুভ্র নয়, শ্বেতচন্দনে চর্চিত তাঁর অঙ্গও। তাঁর পোশাক শুভ্র, তাঁর অলঙ্কার শুভ্র, যে-পদ্মের ওপর তিনি আসীন তাও শুভ্র। তাঁর হস্তধৃত বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র এবং বাদ্যযন্ত্র বীণার বর্ণও শুভ্র। শুভ্র তাঁর বাহন হংসের বর্ণও। তাই তিনি 'সর্বশুক্লা সরস্বতী'।

নির্মল জ্ঞানের ঐশ্বর্যেই মানুষের চরম শক্তি। আন্তর ঐশ্বর্যে যে ঐশ্বর্যবান সে-ই সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। সত্ত্বগুণের চূড়ান্ত বিকাশ যেখানে, সেখানেই মানবমহিমার পরিপূর্ণতা। আমাদের ঋষিরা, সাধকেরা, আচার্যরা জ্ঞান, আন্তর বৈভব এবং

সত্ত্বগুণের আধারস্বরূপারূপে দেবী সরস্বতীর কল্পনা করেছেন এবং তাঁর আরাধনায় মানবমহিমার সার্থক বিকাশ সম্ভব বলে ঘোষণা করেছেন।

কালিকাপুরাণে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে :

"সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।
স্রক্কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা।।
মহাচলস্য পৃষ্ঠস্থা সিতপদ্মোপরিস্থিতা।
শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা।।"

–যে দেবী সরস্বতী নামে পরিচিতা, তাঁর বাম হস্তে (বাম হস্তদ্বয়ে) বীণা ও পুস্তক এবং দক্ষিণ হস্তে (দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে) মালা ও কমণ্ডলু, শুক্লবর্ণধারিণী, মহাচলের পৃষ্ঠস্থিতা, শ্বেতপদ্মাসীনা, শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রা ও শুভ্রালঙ্কারে ভূষিতা।

এ ছাড়াও সরস্বতীর আরো একটি ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়, যদিও তার উৎস অজ্ঞাত :

"যা কুন্দেন্দুতুষারহারধ যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিত যা শ্বেতপদ্মাসনা।।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্র্ সদা বন্দিতা।
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা।।
সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারি–বল্লভা দেবী সর্বশুক্লা সরস্বতী।।
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে।।" (দ্রঃ স্তবকুসুমাঞ্জলি)

–যিনি কুন্দপুষ্প, ইন্দু, তুষার ও মুক্তামালার ন্যায় শুভ্রা যিনি শ্বেতবস্ত্র–পরিহিতা যাঁর হস্ত বীণার বরদণ্ডে শোভিত যিনি শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতি দেবগণের দ্বারা সর্বদা বন্দিতা সেই অশেষ জাড্যবিনাশকারিণী ভগবতী সরস্বতী আমায় রক্ষা করুন। সেই বীণা ও পুস্তক–ধারিণী মুরারিবল্লভা, সর্বশুক্লা, দেবী সরস্বতী আমার জিহ্বায় বাস করুন। হে মহাভাগে, বিদ্যাস্বরূপে, কমললোচনে, বিশ্বরূপে, বিশালাক্ষি সরস্বতি আমায় বিদ্যা দাও তোমায় নমস্কার।

বীণাবাদিনী কেন সরস্বতী? সরস্বতীর হাতে যে–বীণা সে–বীণা সাধারণ নয়। সে–বীণা ব্রহ্মবীণা। সে–বীণায় নিত্য গুঞ্জরিত ওঙ্কারধ্বনি বা প্রণবনাদ। বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য ও সঙ্গীতে প্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে সেই ব্রহ্মনাদেরই মূর্ছনা। জীবনে যখন সুরের অভাব ঘটে তখনি জীবনে নেমে আসে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা। সব সুরের উৎস ওঙ্কারধ্বনি, সকল বাণী ও বর্ণেরও উৎস ওঙ্কার। আমাদের জীবনের শৃঙ্খলার জন্য, জগতের শান্তির জন্য, জীবনের সুরের জন্য আমাদের অশ্রুতে বেজে চলে ভারতীয় বরবীণা।

কেন পুস্তকধারিণী তিনি? ঐ পুস্তক সাধারণ পুস্তক নয়, তা চতুর্বেদ–শ্রুতি, যার মধ্যে বিধৃত জগতের প্রাচীনতম ঋষিদের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলব্ধ সত্য ও জ্ঞানরাশি। যুগ পালটায়, মানুষ আসে, মানুষ যায়, সমাজ পরিবর্তিত হয়। সময় থেমে থাকে না। রুচি, আদর্শ, প্রথা সবই যুগভেদে, কালভেদে পালটায়। শুধু পালটায় না, পরিবর্তিত হয় না শ্রুতিতে বিধৃত আর্য ঋষিদের উপলব্ধ সত্য এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানরাশি। সেই নিত্যসত্য ও নিত্যজ্ঞানরাশির উৎস সরস্বতী। বেদরূপী নিত্যসত্য ও জ্ঞান তাই তাঁর হস্তধৃত।

সরস্বতীর বাহন হংস। সরস্বতীর যে–সমস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তাতে অবশ্য মেষ, সিংহ, ময়ূর এবং হংসকে তাঁর বাহনরূপে দেখা যায়। সরস্বতীর সিংহ এবং মেষ বাহন বৈদিক প্রমাণেও সমর্থিত। কেউ কেউ মনে করেন, সরস্বতীর তীরে ময়ূরের আধিক্যবশত ময়ূর সরস্বতীর বাহনরূপে গৃহীত হয়েছে। সিংহবাহনা সরস্বতীর কল্পনা প্রধানত বৌদ্ধ কল্পনা। তবে সিংহবাহনা সরস্বতীর কল্পনায় সরস্বতী যে দুর্গারই এক রূপ তাও বোঝাতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত 'চণ্ডী'র উত্তরচরিতে বা শুম্ভ–বিশুম্ভবধ উপাখ্যানে দেবতা মহাসরস্বতী। শুম্ভ–নিশুম্ভবিনাশিন্ মহাসরস্বতী দুর্গা

বা চণ্ডীরই এক রূপ। বেদের 'বৃত্রঘ্নী' সরস্বতীর পুরাণের 'শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনী' সরস্বতীতে রূপান্তরের তত্ত্বটি 'চণ্ডী'তে দেবীর স্বমুখেই উদ্গোষিত : "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?"–বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমি একাই বিরাজিত, আমি ছাড়া অন্য আর কে আছে? অজ্ঞানতিমিরান্ধ শুম্ভকে এই অদ্বৈতজ্ঞান সরস্বতী দান করেছিলেন। সরস্বতীই যে দুর্গা এবং দুর্গাই যে সরস্বতী তা মহাভারতের অর্জুনের দুর্গাস্তোত্র থেকেও প্রমাণিত। হংস প্রজাপতি ব্রহ্মার বাহন। কোন কোন পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মাণীরূপেও বর্ণিত। সুতরাং ব্রহ্মার বাহন হংস সরস্বতীরও বাহন–এইভাবেও তিনি হংসবাহনা হয়ে থাকতে পারেন।

মেষ, সিংহ, ময়ূর কখন এবং কিভাবে সরস্বতীর বাহনত্বের গৌরবচ্যুত হয়েছে এবং হংস স্থায়ী বাহনত্বের মর্যাদালাভ করেছে, তা বলা কঠিন। তবে যখন এবং যেভাবেই তা হোক না কেন, সরস্বতী সম্পর্কে শাস্ত্রসমর্থিত ধারণার সঙ্গে তাঁর হংসবাহনত্ব যে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রথমত, 'হংস' শব্দের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য 'আত্মজ্ঞানী'। কারণ, 'হংস' শব্দটি 'অহং সঃ' বা 'সঃ অহম্' ('সোঽহম্')–এই আত্মচৈতন্যসূচক মহাবাক্যের সংক্ষিপ্ত বা পরিবর্তিত রূপ। 'অহংস সঃ'–এই ভাবনাযুক্ত হয়ে যিনি সংসারবন্ধন 'হনন' করেছেন তিনি 'হংস' নামে আখ্যাত। জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কৃপায় মানুষের অন্তরে আত্মভাবনা জাগ্রত হয় এবং পরিশেষে মানুষ আত্মজ্ঞান বা 'তত্ত্বমসি'–জ্ঞান লাভ করে। সরস্বতীর হংসবাহনে সেই তাৎপর্য সূচিত। আত্মজ্ঞানের সাধক সংসারে থাকবেন, কিন্তু তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সংসার তাঁকে লিপ্ত না করতে পারে। পূর্ণ জ্ঞানলাভের পরেও সিদ্ধ সাধককে লোকশিক্ষার জন্য সংসারে থাকতে হয়, কিন্তু সংসারে থেকেও তিনি থাকেন সংসার–নির্লিপ্ত, সংসারের মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর এই অবস্থান জলে বিচরণকারী হংসের সঙ্গে তুলনীয়। হংস জলে বিচরণ করলেও একবিন্দু জল তার গায়ে লাগে না। আত্মজ্ঞানী সাধক সংসারে হংসের মতো নির্লিপ্ত, দেহে থেকেও দেহবোধশূন্য। আত্মজ্ঞানীর সাধনা, আচরণ এবং স্বরূপ–এই তিনটি বিষয়ের সুস্পষ্ট দারণা আমরা পাই হংসের লক্ষ্যার্থে এবং হংসের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ থেকে।

দ্বিতীয়ত, কিংবদন্তি অনুসারে জল এবং দুধ একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেও হংস জলকে বাদ দিয়ে দুধটুকু গ্রহণ করতে পারে। সংসারে 'সঙ্' যেমন আছে, তেমনি আছে 'সার'। হংসের মতো যে সংসারের মধ্যে সারকে গ্রহণ করে অসারকে বর্জন করতে পারে সে–ই বিবেকী। ভোগ, সুখ, ধন, জন, মান, যৌবন–সংসারের এসমস্তই অনিত্য, অসার। অনিত্য ও অসার সংসারে সার বা নিত্য বস্তু হলো ঈশ্বরে ভক্তি এবং বিশ্বাস। সুতরাং সংসারে সাধনের উপায় হংসের মতো বিচার বা বিবেককে আশ্রয়। আর তা করতে পারলেই জীবনের উদ্দেশ্য সত্য–উপলব্ধি সম্ভব।

তৃতীয়ত, বেদান্ত এবং তন্ত্রের মতে হংস পরমাত্মার প্রতীক। আবার 'হংস' পরমাত্মার বাচকও। যোগীরা বলেন, শ্বাসগ্রহণের সময় 'হং' ('অহং') এবং শ্বাসত্যাগের সময় 'সঃ'–'হংস' বা 'অহং সঃ'–এই 'অজপা গায়ত্রী' জপ করলে কালে সাধক পরম জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। 'হংস' মন্ত্র জপের দ্বারা সাধক 'হংস'–এর অর্থাৎ পরম ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদজ্ঞান লাভ করে সংসারচক্র থেকে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সাধনা ও সিদ্ধির পথ বড়ই দুর্গম। সেই দুর্গম পথে সাধকের পুরুষকারের সঙ্গে প্রয়োজন বাগ্বাদিনীর করুণা। ব্রহ্মাণী এবং ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী সরস্বতীর হাতেই যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। কিন্তু জ্ঞান ('হংস') এবং জ্ঞানের লক্ষ্য ('হংস') সম্পর্কে সম্যক্ ধারণার মাধ্যমেই অর্থাৎ হংসের মাধ্যমেই বাগ্বাদিনীর করুণা লভ্য। সরস্বতী সেজন্য হংসবাহনা।

মহাশ্বেতা সরস্বতীর বাহনের বর্ণ কেন শ্বেত? কারণ, সর্বসত্ত্বময়ী শুভ্রাকে বহন করতে হলে তাঁর বাহনকেও তো সর্বসত্ত্বময় হতে হবে। সাধক সাধনার মাধ্যমে সর্বশুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হলে তবেই সরস্বতী তাঁর মধ্যে নিজেকে মূর্ত করেন।

হংস যখন জলে বিচরণ করে তখন দেখা যায় তার গতি ঋজু এবং জড়তাহীন। সংসারে আত্মজ্ঞানীর বিচরণও সেইরকম। অজ্ঞানের তিমির ও কুয়াশাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে জ্ঞানের নির্মল সরোবরে তাঁর ছন্দোময় কাব্যময় জ্যোতির্ময় অভিযাত্রা। তাই শীতের দীর্ঘস্থায়ী রাত্রিশেষে, কুজ্ঝটিকার অবসানে, জড়তার পলায়নে বিশ্বপ্রকৃতির বুকে যখন জেগে ওঠে নবজীবনের সম্ভাবনা, তখনি বাসন্তী পঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমীর প্রভাতে বেজে ওঠে বীণাবাদিনী বাগ্বাদিনী সরস্বতীর বোধনশঙ্খ। তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রকৃতি তখন প্রস্তুত। তাঁর মহাপ্রকাশের লগ্নে তাই নতুন পুষ্পে পর্ণে সুরভিত সুসজ্জিত বৃক্ষলতা, শ্যামল সুষমায় পূর্ণ বসুন্ধরা, মৃদুমন্দ মলয় সমীরণে শিহরিত দশদিক, আকাশ–পৃথিবী মুখরিত পাখির কলতানে। আকাশ

মধুময়, বাতাস মধুময়, জল মধুময়। মধু ঋতুতে হৃদয়কে মধুময় করতে, জীবনকে মধুময় করতে, পূর্ণ করতে, আলোকময় করতে আসেন তিনি–'সর্বশুক্লা সরস্বতী'। V